XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯২ বর্ষ ৪ সংখ্যা রবিবার ১৭ চৈত্র ১৪১৯ কলকাতা

জাল জগৎ

কিছু দিন পূর্বে অকস্মাৎ সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ইন্টারনেট অতিশয় ধীর হইয়া পড়িল, কিছু কম্পিউটার-দুষ্কৃতী আন্তর্জালে কিছু স্প্যাম ঢুকাইয়া এই কাণ্ড করিয়াছিল। এই মুহূর্তে আন্তর্জালের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রহ মহা ঘনঘটায় পাক খাইতেছে, লোকে প্রেম, কাম, ব্যবসায়, সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র উপভোগের জন্য ইহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। লেখাপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, তথ্য-পরিসংখ্যান, ধারণা-প্রয়োগ, সিন্দুকের বদলে কম্পিউটারেই সংরক্ষিত থাকে, আন্তর্জালের মাধ্যমে সরবরাহ হয়। বহু মানুষ নিজ পিতৃনাম জানিতেও এক বার চট করিয়া সার্চ ইঞ্জিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। বিশ্বের অধিকাংশ সাক্ষর মনুষ্যই আজ গুগ্‌ল ব্যতীত নিতান্ত খঞ্জ, উইকিপিডিয়া-র জ্ঞানভাণ্ডার সরাইয়া লইলে— পরীক্ষার হলে টুকিবার কুচি-কাগজ-হৃত ছাত্রের ন্যায় অসহায় ও রোদনোন্মুখ। আর ব্যাংক তো পইপই করিয়া বলিতেছেই, কেহ আমাদিগের বাস্তব শাখায় হাঁটিয়া আসিবেন না, যাবতীয় লেনদেন ভার্চুয়াল প্রকারে সারিয়া লউন। এমন দিন দূরে নাই, যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র কম্পিউটারে হোমওয়ার্ক সারিয়া, শিক্ষকের নিকট মেল করিয়া পাঠাইয়া দিবে, শিক্ষকও বৃহৎ গোল্লা কম্পিউটারেই আঁকিয়া মেল করিবেন। ফলে স্প্যামের হুড়া খাইয়াই হউক, আর অতিকায় আধিদৈবিক বায়সের চঞ্চুর আঘাতে উপগ্রহ-পতনেই হউক, যদি আন্তর্জালের কেরামতি সহসা বন্ধ হইয়া যায়, পৃথিবী চক্ষে অন্ধকার দেখিবে। যে দিন হইতে মানুষের প্রকাণ্ড সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এই জগৎ জোড়া জাল বয়ন শুরু হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতেই এই জাল বিনষ্ট করিবার মতলবেরও সূচনা। অশুভ গণিত-মস্তানরা এক দিন সফল হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

বহু মানুষ নিজ পিতৃনাম জানিতেও এক বার চট করিয়া সার্চ ইঞ্জিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়।

আন্তর্জাল এমন প্রবল প্লাবনের ন্যায় জীবনে ওতপ্রোত সংলগ্ন হয় নাই, এমন দিন আজ প্রাগৈতিহাসিক মনে হয়, কিন্তু আট-দশ বৎসর পূর্বেও ভারতে আন্তর্জালের প্রভাব ছিল নগণ্য। এখনও অধিকাংশ মানুষের কম্পিউটার-ব্যবহারের সুযোগই নাই, যাহাদের আছে তাহারাও ইহার অভ্যাসকে যত গুরুত্বের সহিত দেখিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা। আন্তর্জাল মূলত তাহাদিগের আলস্যের স্যাঙাত। হাঁটিয়া ব্যাংকে যাওয়া ভয়াবহ শ্রমসাধ্য নহে, সর্ব প্রশ্নের উত্তরের জন্য মহাসিধুজ্যাঠার শরণ লওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নহে, নিজ জ্ঞান সংগ্রহের অভ্যাসকে উহা লুপ্ত করিয়া দেয়। ফিল্ম ও সংগীতের বড় কোম্পানিগুলিকে ঠকাইয়া বিনিপয়সায় শিল্প-ভোগ করিবার প্রবণতা তো অতীব অন্যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে আন্তর্জাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীতিহীনতা বা উদ্যমহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়া চলিতেছে। সেই জন্যই ইহার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ও স্ফীত মূল্যায়ন। সমগ্র দিন নিজ কাজ হইতে মুখ সরাইয়া ফাঁকি মারিবার সহস্র উপকরণ ইহা সম্মুখে সাজাইয়া দেয়, আমরা অফিসে বসিয়া সম্পূর্ণ অবান্তর আমোদ-সাইট ঘাঁটিয়া সময় ফুরাইয়া ফেলি। বরং এই সম্মোহন সহসা সরিয়া গেলে আমরা পুনর্বার আকাশের বর্ণ কী সেই বিষয়ে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ চালাইতে পারিব। সত্যই যদি এক অলীক সকালে হ্যাকাররা আশ্চর্য কারিকুরি করিয়া জাল ফাঁসাইয়া দেয়, পিঞ্জরের স্বস্তিতে অভ্যস্ত পক্ষীকে চকিতে আকাশে ছুড়িলে সে যেমন ভীত আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, গোড়ায় তেমন হাহাকার করিয়া দিগন্ত ফাটাইব, অনতি-পরে নিজ হাতেপায়ে কাজ করিবার স্বাধীনতা আমাদিগের ডানায় স্বাভাবিকতার উল্লাস আনিয়া দিবে!

যৎকিঞ্চিৎ

পাশ্চাত্যে একটি সমীক্ষায় দেখা গেল, রবিবার আর ছুটির দিন নয়, বরং সবচেয়ে ব্যস্ত কাজের দিন, কারণ কাচাকুচি থেকে গাড়ি ধোওয়া, বাড়ি পরিষ্কার থেকে আলমারি গোছানো: অফিসের ত্রিগুণ খাটনি দিনটি নিংড়ে নেয়। আমাদেরও তাই, কারণ বাধ্যতামূলক মজা করে নিতে ওই দিন আমাদের ছুটতে হয় মল-এ, ঢুঁ মারতে হয় পঞ্চান্ন দোকানে, দেখতে হয় রদ্দি হিন্দি ফিল্ম, চিবোতে হয় বাসি পপকর্ন, বাচ্চাকে খেলাতে হয় ভিডিয়ো গেম্‌স, আর নিজেকে জপাতে হয়: রিল্যাক্স কল্লুম!

বিশ্বাসের ঠুলি

আকাশে মেঘ জমলে আপনার বাতের ব্যথাটা বাড়ে নাকি? সন্দেহবাতিকগ্রস্ত গিন্নি থেকে জর্জ বুশ জুনিয়র, সবাই যে রোগের শিকার, আপনি তার বাইরে তো? লিখছেন মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

সেই গিন্নিটিকে মনে আছে, যিনি প্রতি দিন স্বামী বাড়ি ফেরার পর তাঁর জামাকাপড়ে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাতেন, যদি কোনও মেয়ের চুলের সন্ধান পাওয়া যায়? বহু দিন খোঁজার পরেও যখন কিছু পাওয়া গেল না, গিন্নি বললেন, ‘ছি ছি, তোমার এত অধঃপতন হয়েছে যে টেকো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছ?’

গিন্নির সঙ্গে ড্যানিয়েল কানেম্যান-এর দেখা হলে তিনি জানতেন, মনস্তত্ত্বের দুনিয়ায় তাঁকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কানেম্যান প্রিন্সটনে মনস্তত্ত্বের প্রফেসর ইমেরিটাস। নোবেল পেয়েছিলেন ২০০২ সালে। তিনি বলেছেন, গল্পের গিন্নির মতো আমরাও আমাদের প্রাথমিক বিশ্বাসের পক্ষে ‘প্রমাণ’ খুঁজে বের করতে রীতিমত দক্ষ। তেমনই দক্ষ বিশ্বাসের বিপক্ষের প্রমাণ অগ্রাহ্য করতে।

কানেম্যান তাঁর ‘থিঙ্কিং ফাস্ট অ্যান্ড স্লো’ বইটিতে একটা পরীক্ষার কথা বলেছেন। বেশ কয়েক জন লোককে বেছে নিয়ে দু’দলে ভাগ করা হল। দু’দলকেই আলাদা ভাবে একটা ছবি দেখানো হবে। প্রথম দলকে দেখানো হবে একই ছবির দশটা স্লাইড— প্রথমটা একেবারে অস্পষ্ট, তার পর ক্রমে স্পষ্ট হতে হতে দশ নম্বর স্লাইডে এসে মোটামুটি স্পষ্ট। দ্বিতীয় দলকে দেখানো হবে পাঁচটা স্লাইড— প্রথম দলকে যে দশটা দেখানো হয়েছিল, তার শেষ পাঁচটা। শেষে দু’দলকেই বলতে হবে, কীসের ছবি দেখলেন তাঁরা।

কোন দলের বেশি লোক ঠিক উত্তর দিয়েছিলেন? আন্দাজ বলবে, প্রথম দল। কারণ ছবিটা তাঁদের সামনে একটু একটু করে তৈরি হয়েছে। আসলে কিন্তু দ্বিতীয় দলের তুলনায় প্রথম দলের ঠিক উত্তরদাতার সংখ্যা অনেক কম। কারণ? প্রথম দলের লোকরা একেবারে অস্পষ্ট অবস্থায় ছবি দেখেছিলেন, এবং সেই ছবিটি দেখেই তাঁরা ছবির আন্দাজ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তার পর ছবি যত স্পষ্ট হয়েছে, তাঁরা নিজেদের আন্দাজের পক্ষে ‘প্রমাণ’ খুঁজে নিয়েছেন। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় এই ঘটনাটার নাম হল ‘কনফার্মেশন বায়াস’— বাংলায়, ‘বিশ্বাসের ঠুলি’।

যেমন ধরুন, আকাশে মেঘ জমলে নাকি বাতের ব্যথা বাড়ে। যদি বলি, এটা একটা আষাঢ়ে বিশ্বাস— অমনি অনেকেই তেড়ে আসবেন। বলবেন, নিজে দেখেছি, মেঘলা দিনে ব্যথা বাড়ে। দেখেছেন তাঁরা ঠিকই, কিন্তু আধখানা দেখেছেন। যে দিন আকাশে মেঘ আর তাঁদের গায়ে ব্যথা— সে দিনটা তাঁদের মনে থেকে গিয়েছে। আবার, যে দিন আকাশ ঝকঝকে, শরীরও ব্যথাহীন, সে দিনটাও মনে আছে। কিন্তু আকাশে মেঘ অথচ শরীরে ব্যথা নেই, এবং শরীরে ব্যথা কিন্তু আকাশে মেঘ নেই— এই দুই ধরনের দিনের কথা তাঁদের মন বেমালুম ভুলে গিয়েছে। তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মন বেছেবুছে প্রমাণ তুলে রেখেছে। বহু তুকতাক, সংস্কারের পিছনের কারণ এটাই। মানুষের মাথা আসলে একটা গল্প বানানোর যন্ত্র। আমাদের মন গোড়ায় একটা বিশ্বাস স্থির করে নেয়, তার পর সেই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি খাড়া করে একটা ‘বিশ্বাসযোগ্য’ গল্প তৈরি করে।

ভাবুন তো, চোখ বেঁধে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছেন! শিউরে উঠলেন? আপনার মন আপনাকে দিয়ে এটাই করাচ্ছে।

এই যে পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের বাইরে আর কিছু দেখতে না পাওয়া, এটা মনের চোখে পাকাপাকি ভাবে ফেট্টি বেঁধে রাখা। ভাবার চেষ্টা করুন তো, চোখে ফেট্টি বেঁধে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছেন! শিউরে উঠলেন? আপনার মনের ‘গল্প বানানোর মেশিন’ কিন্তু আপনাকে দিয়ে এই কাজটাই করাচ্ছে— অনিশ্চিয়তায় ভরা দুনিয়ায় আপনাকে মনগড়া গল্পের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

উপরন্তু, আমরা সাধারণত একটা ‘একো চেম্বার’-এ বাস করি। অর্থাৎ, আমরা তাঁদের সঙ্গেই বেশি মিশি, বেশি সময় কাটাই, বেশি আলোচনা করি— যাঁরা আমাদের মতো। আমরা যে কথা বিশ্বাস করি, তাঁরাও সেই কথাই বিশ্বাস করেন। আমরা যখন কথা বলি, একই কথা বলি। গত কাল আমি আপনার থেকে যে কথাটা শুনেছিলাম, তখন যেহেতু সে কথাটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম— আজ আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় সে কথাটাই নিজের কথা হিসেবে বলি। আপনি এক দিনের ব্যবধানে নিজের কথাই শোনেন, কিন্তু ভাবেন, সবাই এ রকম বলছে। অনেকে এক সঙ্গে এই ভাবে একে অপরকে বিশ্বাস জোগালে ও বিশ্বাস করলে একটা বিশ্বাসই ঘুরতে থাকে— তার বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও।

এর ফলে কী মারাত্মক বিপদ হতে পারে, তার প্রমাণ ২০০৮ সালের মার্কিন সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস। সে দেশে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তখন বাড়ি কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ দিতে আরম্ভ করেছিল। কারণ, বাড়ির বাজারে দাম দারুণ ভাবে বাড়ছিল। সেই বাজারে ঋণ দেওয়ার পরিমাণও বাড়িয়েছিল ব্যাঙ্কগুলো, কারণ প্রত্যেক ব্যাঙ্কারই বিশ্বাস করছিলেন যে দাম আরও বাড়বে। এই ঋণের ঋণপত্রের ভিত্তিতে এক ব্যাঙ্ক ঋণ দিচ্ছিল আর এক ব্যাঙ্ককে। পুরো লেনদেনটাই দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিশ্বাসের ওপর— এই ঋণের মার নেই। যাঁরা বিশ্বাস করছিলেন এই কথায়— বস্তুত সবাই, যাঁরা এই ব্যবসায় জড়িত— তাঁরা আসলে একে অপরের কথায় নিজেদের বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনছিলেন। শেষে এই ঋণের বাজার ভেঙে পড়ল, কারণ এখানে বিশ্বাসই ছিল, বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি ছিল না।

আর এক মোক্ষম উদাহরণের দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে ২০১৩ সালে। ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধানে মার্কিন অভিযানের। এই যুদ্ধের কার্যকারণের মধ্যে যেতে চাই না। আমেরিকা নানান অজুহাতে অনেক যুদ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু ইরাকে যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়া যায়নি, সে কথা পরে মার্কিন প্রশাসনও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এ কথা রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্ত্র পরিদর্শকরা ২০০৩ সালের মার্চেই বলেছিলেন কিন্তু তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগের তৈরি করা ভ্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুশ রণদামামা বাজিয়ে দিলেন।এই গণবিধ্বংসী অস্ত্রের গল্পটি মার্কিন প্রশাসনের সবাই যে বিশ্বাস করেছিলেন, তা নয়। তবে এটুকু বলাই যায় যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালানোর সময় যে বক্তব্যের ওপর মার্কিন প্রশাসন এতখানি জোর দিয়েছিল, সেই বক্তব্য পরবর্তী কালে এমন শোচনীয় ভাবে সর্বসমক্ষে মিথ্যা প্রমাণিত হবে জানলে হয়তো তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ের কৌশল পাল্টাতেন। অর্থাৎ, এখানে কনফার্মেশন বায়াসের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হয়তো মার্কিন ব্যাঙ্কিং দুনিয়াতে কারও কারও মনে সন্দেহ ছিল, যেটা চলছে তার বাস্তব ভিত্তি নেই। হয়তো মার্কিন প্রশাসনেও কেউ ভেবেছিলেন, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের গুজবটা খতিয়ে দেখা ভাল। কিন্তু যেখানে সবাই এক কথা বলছে, একই মতে বিশ্বাস করছে, সেখানে উল্টো কথা বলার বিপদ অনেক। কাজেই, ‘বুদ্ধিমান’ লোক এমন পরিস্থিতিতে নিজের মতটি চেপে যান। প্রচলিত মতের পক্ষেই কথা বলতে থাকেন। এই প্রবণতার নাম হল ‘কনফর্মিজম বায়াস’। ভিন্ন মতকে চেপে রেখে এই প্রবণতা কনফার্মেশন বায়াসের পথ আরও প্রশস্ত করে দেয়।

কনফার্মেশন বায়াস থেকে তৈরি হতে পারে ‘আমরা-ওরা’র বিভাজন। কনফার্মেশন বায়াস আমাদের তথ্য বাছাই করতে বাধ্য করে— তাতে অনেক জরুরি তথ্য, আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বলে, ছাঁটাই হয়ে যায়; আর অনেক বিভ্রান্তিকর ‘তথ্য’ ঢুকে পড়ে আমাদের মনে। তার প্রত্যক্ষ ফল, সমাজের মধ্যে মতামতের দুটো ভিন্ন মেরু তৈরি হয়ে যায়। এক মেরু অপর মেরুর যাবতীয় বিশ্বাসকেই সন্দেহের চোখে দেখে, অপর মেরুর বিশ্বাসের সঙ্গে যে তথ্য খাপ খায়, তাকে শুধু সেই কারণেই নিজের মনে ঢুকতে দেয় না। যাঁরা জানেন বা বোঝেন, তাঁরা চুপ করে যান— ‘আমরা-ওরা’র কোলাহলে হারিয়ে যায় উন্নয়নের দিশা।

মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক

মেনে নিতে নিতে

• নেপিদ’ • ২৭ মার্চ মায়ানমারের রাজধানী নেপিদ’য় বার্ষিক সেনা দিবসের অনুষ্ঠানে সামরিক কর্তাদের পাশে বসে থাকতে দেখা গেল বিরোধী নেত্রী আউং সান সু চি’কে। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রী মায়ানমারের সংসদে সিকিভাগ আসন এখনও সেনাবাহিনীর দখলে, প্রশাসনে উর্দির দাপট এখনও প্রবল। কিন্তু দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী এবং প্রতিভূ সু চি সামরিক কর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন, কারণ তাঁর মতে এটাই শান্তিপূর্ণ উত্তরণের পথ, সমৃদ্ধিরও। তাঁর দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডিমক্র্যাসির অন্দরে এবং বৃহত্তর নাগরিক সমাজে তাঁর এই নীতি নিয়ে সংশয় আছে, সেনা দিবসের উৎসবে তাঁর উপস্থিতি অবশ্যই সেই সংশয়ে ইন্ধন জোগাবে। তবে শান্তি ও সুস্থিতির জন্য দেশে অন্তত আপাতত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন— এই যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। ২০১১’য় প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটার পরে মায়ানমারে বৌদ্ধ-মুসলিম সংঘর্ষ চলছেই। গত বছরে পশ্চিমাঞ্চলে রোহিঙ্গিয়ারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, গত কয়েক দিনে মধ্য মায়ানমারের বিভিন্ন শহরে সংখ্যালঘু

পৃথিবী

২৪ - ৩০ মার্চ

মুসলমানদের উপর ৯৬৯ নামাঙ্কিত জঙ্গি বৌদ্ধ গোষ্ঠীর আক্রমণে দশ হাজারের বেশি মানুষ ঘরছাড়া, ইতিমধ্যেই প্রায় অর্ধশত প্রাণ গিয়েছে। পুলিশ এই হিংসা দমনে ব্যর্থ, সেনাবাহিনীকে সরাসরি শান্তিরক্ষায় নামতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট থেইন সেন বলেছেন, মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করার যে অধিকার সংবিধান তাঁকে দিয়েছে, প্রয়োজন অনুসারে তার পূর্ণ ব্যবহার করতে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ। লক্ষণীয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণের বিরুদ্ধে সু চি বিশেষ মুখ খোলেননি। সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, এই প্রশ্ন তুললেও তিনি সাধারণত উত্তর দেন না, ‘ঠিক জানি না’ বা ‘এটা জটিল প্রশ্ন’ গোছের না-জবাব দেন। মানবাধিকার আন্দোলনের নোবেলজয়ী প্রতিবাদ-প্রতিমা কি ক্রমশ স্থিতাবস্থার অধিষ্ঠাত্রী হয়ে উঠছেন?

ইউরোর দোহাই

• নিকোসিয়া (সাইপ্রাস) • ‘পিগ্‌স’-এর পর সাইপ্রাস। ইউরোপের আর্থিক ডামাডোলের সর্বশেষ শিকার। সে দেশের ব্যাঙ্কগুলো গত কয়েক বছরে যত ঋণ দিয়েছিল, তার পরিমাণ দেশের জাতীয় আয়ের সাড়ে আট গুণ! সেই ঋণের অনেকটাই আবার গিয়েছিল গ্রিসে। ফল, কেলেঙ্কারি। মার্চের মাঝামাঝি দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রায় লাটে ওঠার জোগাড়

হয়েছিল। আপাতত ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আই এম এফ আপৎকালীন ঋণ দিয়ে পরিস্থিতি সামলেছে। সাইপ্রাসকে ই ইউ’তে রেখে দেওয়া হল। লাখ দশেক মানুষের এই ছোট্ট দেশটি নিয়েও এত মাথাব্যথা কেন? কারণ, সাইপ্রাসের আর্থিক গুরুত্ব যতই কম হোক, ইউরোর ভাঙন আটকানো অতি জরুরি ছিল। এই মুদ্রার মাহাত্ম্য দাঁড়িয়ে আছে একটাই বিশ্বাসের ওপর— এর অংশী হলে যে কোনও সংকটই সমাধানযোগ্য। এই বিশ্বাস ভাঙলে ইউরো অঞ্চলে আরও ধস নামার সম্ভাবনা। সাইপ্রাসকে না বাঁচিয়ে ইউরোপের তাই গতি নেই।

ঘোষণা করেছেন, স্বাক্ষর করার সময়ে ‘পোপ ফ্রান্সিস’ লিখবেন না, ‘ফ্রান্সিস’-ই লিখবেন। ঘোষণা করেছেন, অন্যান্য পোপ-রা যেখানে থাকেন, সেই অ্যাপোস্টলিক প্যালেস-এর অ্যাপার্টমেন্ট-এর থাকতে যাবেন না, তার বদলে ভ্যাটিকান-এর সান্টা মারিয়া হোটেলেই থাকবেন। আগের পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের লাল ভেলভেট চাদর গায়ে দিতে অরাজি হয়েছেন। বুয়েনস এয়ারেস-এ যেমন ছিলেন, তেমনই থাকবেন ভ্যাটিকানেও, বলে দিয়েছেন। তাঁকে ‘বিশপ অব রোম’ বলতে হবে, প্রথামতো ‘ভিকার’ বা ‘ক্রাইস্ট’ বলা চলবে না। বন্ধুদের বলে দিয়েছেন, ‘পোপ’ বলে সম্বোধন চলবে না, আগের মতো ‘বের্গোগলিয়ো’ বলেই ডাকতে হবে।

সব দেখেশুনে অনেকের মত, নতুন পোপ এখনও ঠিক ধাতস্থ হননি। বিশ্বের ১২ কোটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের ভার যে তাঁর উপরেই ন্যস্ত, সেটা ভাল করে এখনও তাঁর অন্তঃস্থ হয়নি।

তাই কি? তাঁর মধ্যে নতুন পদের মহিমা ঠিকঠাক প্রবিষ্ট হলেই তিনি এই সব বায়না থেকেই সরে আসবেন? মনে হয় না।

বরং মনে হয়, নতুন পোপ বোধহয় পোপ-তন্ত্রের ধারণাটাতেই একটা বদল ঘটাতে চাইছেন। সাধারণ জীবন থেকে অনেকখানি দূরত্বে এই যে রাজকীয় মহিমময়

নজরবন্দি

অস্তিত্ব, তার রহস্যময়তা ও ঐশ্বর্যময়তা কমিয়ে পদটিকে মাটির কাছে নিয়ে আসতে চাইছেন। ‘কিপ ইট সিম্পল’। প্রধান বিশপ হিসেবে আর্জেন্টিনাতেও তো ‘সিম্পল’ জীবনই যাপন করেছেন ইনি, ডাউনটাউন-এর সাধারণ বাড়িতে থেকেছেন, ছোট্ট স্টোভ জ্বালিয়ে ঘর গরম করেছেন, বাসে করে যাতায়াত করেছেন। অন্যদের থেকে বরাবরই আলাদা লেগেছে ওঁকে। পোপ হিসেবেও আলাদা হতে চান এখন। এতে ওঁর নিজের ইমেজ-এর প্রশ্ন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আছে আরও গুরুতর একটা বিষয়। নতুন ধারার পোপের হাত ধরে এই প্রথম কোনও আধুনিক পোপ সাধারণ জীবনের কাছাকাছি চলে এলেন: ধর্মীয় শ্রেণিভেদের বিরুদ্ধে, প্রতীকী হলেও, এ এক বিরাট প্রতিবাদ।